অতনু চক্রবর্তী

বাংলা ছবির গানদরিয়া

'সাইলেন্ট ফিল্ম ইজ দ্য পিওর ফিল্ম'—কোনো কোনো পশ্চিমি বিশুদ্ধবাদী সিনেমা তাত্ত্বিকদের এই আপ্তবাক্য স্মরণে রাখলে সিনেমার গান নিয়ে আলোচনা অবান্তর প্রলাপ। শব্দই যেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত, সেখানে সংগীতশিল্পের অনুপ্রবেশের প্রশ্নই ওঠে না—গান তো আরও দূরের আকাশ। এতদসত্ত্বেও সিনেমার গান নিয়ে আলোচনায় যেতে হলে এই মত বা সিনেমাবৃত্তের এই মেরু থেকেই কেন্দ্রাভিমুখী অভিযান জরুরি, কারণ এর বিপরীত মেরুতে রয়েছে আর-একটি স্টেটমেন্ট—'ভারতীয় সিনেমায় গান অনেক সময়ই সিনেমাটির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।'

চলচ্চিত্রের প্রাণভোমরা যেহেতু ইমেজের বিন্যাস সেক্ষেত্রে নির্বাক ছবির 'শুদ্ধতা'-বিষয়ক প্রস্তাবটির মধ্যে সারবত্তা আছে, কিন্তু মাধ্যম হিসেবে সিনেমা অন্যান্য শিল্পমাধ্যম থেকে প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ক্রমশ সমৃদ্ধি অর্জন করে নিজস্ব ভাষা সন্ধানে সতত সক্রিয়। সাহিত্য-চিত্রকলা-ভাস্কর্য—আলোকচিত্রের মতো মাধ্যম থেকে উপযোগী এলিমেন্ট সংগ্রহে তৎপর সিনেমা, সংগীতের মতো উৎকর্ষের শিল্পকে ব্রাত্য করে রাখবে কেন এ প্রশ্নের উত্তরে সংগীতের বিমূর্ত রূপবন্ধ, নার্কোটিক এফেক্ট ইত্যাদি 'গুণ'-এর কথা বলা হয়েছিল যা সিনেমায় 'দোষ'-এর হয়ে ওঠে। বহুচর্চিত এসব বিতর্ক তার সারবস্তুটি রেখে হারিয়ে গেছে—এসেছে সংগীত, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সিনেমার সঙ্গী হতে। এই প্রয়োজন অর্থাৎ অনিবার্যতা এবং চাহিদা অর্থাৎ ট্রেন্ডের অঙ্কটিই সিনেমা সংগীতের এরিনায় মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সক্রিয়।

নির্বাক ছবি বিশুদ্ধ হলেও ছিল 'প্রতিবন্ধী'; প্রয়োজনেও তার শব্দ বা সংগীত ব্যবহারের সামর্থ্য ছিল না, সেক্ষেত্রে সবাক ছবি প্রয়োজন হলেই শব্দ বা সংগীত বর্জন

করতে পারে। সিনেমায় ইমেজ ছাড়া আছে কেবল শব্দ, সেই শব্দ কখনও সংলাপ, কখনও তা পারিপার্শ্বিক থেকে আসে, কখনও তা তৈরি করা হয়। এই তৈরি শব্দের সুষম বিন্যাসই সংগীত—যা বিমূর্ত। সুর কথার বাহন হলে গান হয়। চলচ্ছবি দর্শনের প্রাথমিক 'বিস্ময়ের উজ্জীবন'-এর ঘোর কাটতে-না-কাটতেই শ্রবণের চাহিদা ক্রমশ তীব্র হয়েছিল। সিনেমা সঙ্গীত উদ্ভুত হয়েছিল 'নয়েজ' থেকে কিন্তু যথার্থ ফিল্ম মিউজিকের ভিত্তিভূমি সাইলেন্স। প্রোজেক্টরের একঘেয়ে শব্দ আড়াল করবার তাগিদে 'প্রয়োজন' হয়েছিল সংগীতের। সেই সূত্র ধরেই নির্বাক ছবির সঙ্গে এল লাইভ কনসার্ট বা গানের প্রচলন, যা দর্শককে আমোদিত হবার সুযোগ দিয়েছে। সেখান থেকেই মূলধারার ছবিতে তৈরি হয়েছে মিউজিক্যাল 'ট্রেন্ড'।

উনিশশো ছাব্বিশে আমেরিকায় প্রদর্শিত বিশ্বের প্রথম সবাক ছবি 'ডন জুয়ান'-এর পাত্রপাত্রীরা নির্বাক অর্থাৎ সংলাপ ছিল না, সংগীত ছিল। পরের বছর দেখা গেল সে দেশেরই ছবি 'জ্যাজ সিংগার' নামেই ঘোষণা যে গান না থাকলে ছবিটি পঙ্গু হয়ে যায়। এদেশে প্রদর্শিত হলিউডের প্রথম টকি 'শো বোট', তাতে ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে গান শুনিয়েছিলেন লরা লা প্লান্টে। এই দুটি ছবির প্রেরণায় আমাদের দেশের পূর্ব এবং পশ্চিম অংশে দুই উদ্যোগপতি শিল্পী, ছবিতে গান শোনানোর ব্রত নিয়েছিলেন। পশ্চিম প্রথম সাফল্য পেয়েছিল, সাতটি গানে সেজেছিল ভারতের প্রথম টকি আর্দেশীর ইরানীর 'আলম-আরা'। তার ঠিক পেছনেই ছিলেন পূর্ব ভারতের জামসেদজি ম্যাডান, তিনি বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম টকিতে গান জোগাতে পারেননি, তবে ছবিতে সংগীত পরিচালক ছিলেন, যিনি চলমান ছবির সঙ্গে স্বয়ং গান শুনিয়েছিলেন। ম্যাডানের পরের ছবি 'শিরি ফরহাদ', সে ছবিতে ম্যাডান বিয়াল্লিশটি গান শুনিয়ে সুদে-আসলে মিটিয়েছিলেন দর্শকদের গানের খিদে। সিনেমা ভেসেছিল গানদরিয়ায়। এই খিদে অর্থাৎ দর্শকের ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ছক ধরেই ভারতীয় ছবিতে এসেছে গানের জোয়ার। পশ্চিমি দেশের সিনেমায় নির্বাক যুগ শেষ হবার আগেই শুরু হয়ে গেছে চলচ্চিত্র ভাষার সন্ধান এবং সংগীতকে ইমেজের সঙ্গে মিলিয়ে তাৎপর্যবাহী প্রয়োগ নিরীক্ষা। সেক্ষেত্রে ভারতীয় ছবিকে টকির সূত্রপাত থেকে অন্তত সিকি শতাব্দী প্রতীক্ষা করতে হয়েছে, ইমেজ এবং সংগীতের সিনেম্যাটিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপনে।

বাংলা ছবির আদি যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী উদ্যোগপতি ম্যাডান, সিনেমাকে পুরোপুরি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখেছিলেন। করিন্থিয়ান থিয়েটারের কর্তা ম্যাডান, সিনেমা-পূর্ব বিনোদনী মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে প্রভাবশালী থিয়েটারের সঙ্গে

যুক্ত থাকার সূত্রে নাট্যগীতির চাহিদা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। উপরন্তু সে-যুগের সিনেমা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে থিয়েটার প্রভাবিত। অতএব নাটকের মতোই চলচ্ছবির ফাঁকে ফাঁকে গান গুঁজে দেবার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি এবং সমকালীন বায়োস্কোপ।

বঙ্গদেশে এই গানপ্রীতির শেকড় ছিল আরও গভীরে। পারফর্মিং আর্ট হিসেবে সিনেমা-পূর্ব ক্যানভাসে ধারাবাহিকভাবে গানবাজনার প্রাধান্য স্বীকৃত। কথকতা-যাত্রা-পাঁচালি-কীর্তন-কবিগান থেকে সঙের মিছিল সর্বত্রই ছিল গানের ব্যবহার, অন্যদিকে সমাজজীবনে বারোমাসে তেরো পার্বণ সাধন-ভজন-ব্রত উৎসব সবই সংগীতমুখর। সদ্যোজাত শিশুর জন্য ঘুমপাড়ানি গান থেকে সদ্যমৃত মানুষের জন্য নাম-কীর্তন, কোথায় গান নেই? বাউল পথে ঘোরে গান গেয়ে, ছাদ পেটাতেও গান গায় শ্রমিক, মাঝি-মাল্লা গান গায় দাঁড় টানার সঙ্গে। জীবনের সুখ-অসুখের সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে গান। ফলে গান বাদ দিয়ে সেদিন সিনেমার মতো নবীন মাধ্যমের স্ট্রাকচার ভাবাই সম্ভব ছিল না। দর্শক-শ্রোতাকে গানে মজিয়ে খুশি করাও তাই সিনেমার উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল। সবাক ছবির আদি পর্বে বিস্তর প্রতিকূলতা পেরিয়েও তাই গান সংযোজন ছিল অনিবার্য। সেই ফাঁকে সিনেমার গানের বিশেষ কোনো আইডেনটিটি তৈরির বদলে সমকালীন এবং প্রচলিত গানের নানা দৃষ্টান্ত ঢুকে পড়েছে সিনেমার সাউন্ডট্র্যাকে। এদেশে চলচ্ছবি ধারণ ও প্রদর্শনে অগ্রণী পুরুষ হীরালাল সেন ফিচার ফিল্মের দেউড়ি খুলে দিতে স্টেজ থেকে নাটকের অংশ সেলুলয়েডে তুলে আনবার যে উদ্যোগ করেছিলেন, সেই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে বাংলা ছবির অনেক সময় লেগেছে। নাটকের অভিনেতা, নাটকের কাহিনি, নাটকের গান—সর্বোপরি অভিনয়ে নাটুকে অ্যাপ্রোচ বিস্তর প্রভাব ফেলেছিল সিনেমায়।

বাংলা সিনেমা যখন গান গাইতে শুরু করে, 'গানের জন্যই গান' এই সূত্র ধরে সমকালীন বাংলা গানের নমুনাই ঢুকে পড়েছিল ছবির ভাঁজে ভাঁজে। সেসময় নাটকের গানের রমরমা ছিল, ফলে টকির প্রথম বছরে 'দেনা পাওয়া' ছবিতে শোনা গিয়েছিল মঞ্চে জনপ্রিয় 'ষোড়শী' নাটকের একাধিক গানের হুবহু প্রতিরূপ। 'প্রহ্লাদ' ছবিতেও ব্যবহার করা হয়েছিল স্টেজের অনুসারী গান।

টকির প্রথম দশকে স্টেজে জনপ্রিয় নাটক অনুসরণে অনেক ছবি তৈরি হয়েছে, সেই সূত্র ধরে গিরিশ ঘোষ থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক নাট্যগীতি স্থান পেয়েছে সিনেমায়। অন্যদিকে সিংহভাগ ছবির বিষয় পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান-আহরিত হবার ফলে ভক্তিগীতির প্রাবল্যও অনিবার্য ছিল। সেইসঙ্গে শ্রী

গৌরাঙ্গ, মীরাবাই, তুলসীদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে রেখে তৈরি ছবিতে পদাবলী, কীর্তন, ভজন সিনেমার গানে অনিবার্যভাবেই এসেছে। সামাজিক বিষয়-আশ্রিত ছবির গান ছিল তৎকালীন রেকর্ড সংগীতে প্রচলিত বাংলা গানের অনুসারী। বাংলা ছবিতে যখন গান প্রয়োগের সূত্রপাত তার তিন দশক আগেই রেকর্ড সংগীতের যাত্রা শুরু হয়ে গেছে, রেডিয়োর বয়েস বছর পাঁচেক অর্থাৎ হামাগুড়ি দেবার পর্যায় চলছে। এই দুই মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী-গীতরচয়িতা এবং সুরকারদেরই সিনেমা ব্যবহার করেছে, ফলে গানে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্মাণের প্রশ্ন গৌণ রয়ে গেছে। যে-কোনো প্রকারে গান সংযোজন সিনেমার উদ্দেশ্য ছিল বলেই সিনেমার গানের 'সূত্রপাত' ঘটেছিল সমঝোতার শর্তে, ফলে সিনেমার স্বার্থ নিয়ে সেদিন ভাবনা-চিন্তা তেমন হয়নি। প্রায় দোরে দোরে ঘুরে বাদ্যযন্ত্রী জুটিয়ে সিনেমা সংগীতের জন্য অর্কেস্ট্রা দল গড়া হয়েছিল, 'গায়ক-অভিনেতা' হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; রেকর্ডের গাইয়েদের গান গাওয়ার জন্য প্রায় জোর করেই ক্যামেরার সামনে দাঁড় করানো হয়েছে। কানন দেবী, পাহাড়ি সান্যাল, উমাশশী, কৃষ্ণচন্দ্র দের মতো গাইয়েদের পাশাপাশি এভাবেই কমলা ঝরিয়া, আঙুরবালা, ইন্দুবালার মতো গাইয়েকে অভিনেত্রী হিসেবে দেখা গেছে। হীরেন বসু, রাঁইচাদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, হিমাংশু দত্ত, অনাথনাথ বসু, নিতাই মতিলালের মতো শিল্পীরা নিয়েছেন সুর-রচয়িতার ভূমিকা। নায়ক গান গাইতে অক্ষম হলে সহশিল্পীকে দিয়ে গানের অভাব পূরণ করা হত। উনিশশো একত্রিশে বাংলা ছবিতে গান শোনানো শুরু, পরের বছর মুক্তি পায় নিউ থিয়েটার্সের প্রথম বাণিজ্যসফল ছবি 'চণ্ডীদাস'। চণ্ডীদাস পদ রচনা করে গাইছেন এটি স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু ওই ছবিতে রামী গেয়েছেন চণ্ডীদাসের পদ, শ্রীদামবেশী কৃষ্ণচন্দ্র দের গাওয়া 'সেই তো বাঁশি বাজিয়েছিলে', 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু, 'ফিরে চল আপন ঘরে', বা চণ্ডীদাসের 'শতেক বরষ পরে' প্রথমত সিনেমায় এবং প্রকাশিত রেকর্ডে দারুণ জনপ্রিয় গান—কিন্তু চণ্ডীদাসকে গানের একটি কলিও গাইতে শোনা যায়নি, কারণ ওই চরিত্রের অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গান গাইতে পারতেন না। কোনো ছবির নায়ক গান গাইতে অক্ষম হলে, ছবিতে গানের জোগান অব্যাহত রাখতে অন্ধ ভিখিরি বাউল বোষ্টমি বৈতালিকের চরিত্র আনা হত। যেমন কৃষ্ণচন্দ্র দে ছিলেন অন্ধ ভিক্ষুকের ভূমিকায় রীতিমতো চাহিদার কেন্দ্রে।

পৌরাণিক ছবির ক্ষেত্রে এমন সমস্যায় পড়লে তৈরি করে নেওয়া হত 'নারদ'-এর চরিত্র। নারদ সুগায়ক, অতএব তার কণ্ঠে অনায়াসে গান জোগানো যায়। উনিশশো তেত্রিশ থেকে বছর পাঁচেক সময়ের মধ্যে বাংলা ছবির নারদদের দিকে নজর

দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। 'যমুনা পুলিনে' ছবিতে নারদ সেজেছিলেন ধীরেন দাস, 'রাধাকৃষ্ণ' ছবিতে নারদ ছিলেন ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়, 'সাবিত্রী' ছবিতে ধীরেন দাস, 'দক্ষযজ্ঞ'-র নারদ মৃণাল ঘোষ 'প্রভাস মিলন' এবং 'কৃষ্ণ সুদামা' ছবিতেও নারদ সেজেছিলেন। 'ধ্রুব' ছবিতে নারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি পথিকৃৎ কম্পোজার কাজি নজরুল ইসলাম। ওই ছবিতে সংগীত পরিচালক নজরুল তাঁর গানের বিশ্বস্ত রূপকার আঙুরবালাকে ধ্রুবর-মায়ের চরিত্রে অভিনেত্রী হিসেবে নিয়ে, তাঁকে দিয়েও গান গাইয়েছিলেন।

অর্থাৎ কীর্তন, বাউল, ভক্তিগীতি, নাট্যগীতি এবং সেসময় রেকর্ডে প্রচলিত বাংলা গানেরই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল টকির প্রথম পর্বের ছবিতে। তিরিশের দশক রেকর্ডের গানে কাজির গানের দশক হিসেবে চিহ্নিত ছিল, সেক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম 'ধ্রুব' ছাড়াও 'গ্রহের ফের' এবং 'সাপুড়ে'-র মতো ছবির জন্য গান লিখে সুর করেছিলেন। ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত 'গোরা' ছবিটিরও সংগীত পরিচালক ছিলেন নজরুল, তবে সে ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গানই ব্যবহার করা হয়েছিল। গ্রামোফোন রেকর্ডে তখন রবিবাবুর গানের ক্রমশ চাহিদাবৃদ্ধি ঘটছে। তবে বাংলা ছবিতে প্রায় শুরুর দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যবহার দেখা গেছে, যা ক্রমশ সংখ্যা এবং প্রভাবে তাবৎ কম্পোজারদের ছাপিয়ে গেছে। মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগ্রহী এবং আশাবাদী রবীন্দ্রনাথের কাহিনি নিয়ে নির্বাক যুগের ছবি তৈরি হয়েছে 'গিরিবালা'। টকির দ্বিতীয় বছরেই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'নটীর পূজা' সেলুলয়েডে ধরে রাখবার উদ্যোগ হয় এবং সে বছরেই 'চিরকুমার সভা' নিয়ে তৈরি হয় প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের ছবি। সেই থেকে এতাবৎ অন্তত পঞ্চাশটি ছবি তৈরি হয়েছে রবীন্দ্ররচনা আশ্রয় করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ছবির সঙ্গী হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত। উনিশশো সাঁইত্রিশে 'মুক্তি' ছবির সূত্র ধরে বাংলা ছবিতে রবীন্দ্রগানের প্রয়োগের উদ্যোগ থেকে এতাবৎ পাঁচশোরও বেশি রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার হয়েছে বাংলা ছবিতে, যা একজন গীতিকার-সুরকারের গান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বকালীন রেকর্ড।

বাংলা ছবির গানে রবীন্দ্রপ্রভাব অন্যভাবেও পড়েছে—রাঁইচাঁদ বড়াল বা পঙ্কজ কুমার মল্লিকের মতো দিক্‌পাল সংগীত পরিচালকেরা যেমন অনেক গানের সুরেই রাবীন্দ্রিক নির্যাস ছড়িয়ে দিতেন, রবীন্দ্রনাথের সমকালীন অনেক কবির মতোই গীত-রচয়িতারাও তাদের অনেক স্তবকে রাবীন্দ্রিক ভাব অনুসরণের প্রয়াস করেছেন। প্রাথমিক এইসব পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে খানিকটা স্বাতন্ত্র্যে ছবির গানকে সাজিয়ে

তোলবার সুযোগ এল উনিশশো পঁয়ত্রিশে 'প্লে-ব্যাক' প্রথা প্রবর্তনের সূত্র ধরে। ততদিনে সিনেমা বাণিজ্য হিসেবে বেশ প্রভাববিস্তারী, ফলে অনেক গুণী গায়ক-সুরকার-গীতরচয়িতা সিনেমার গানে তাদের সামর্থ্য বিনিয়োগের সুযোগ পেয়ে এগিয়ে এলেন। সিনেমার উদ্দেশ্যসাধন তাদের তেমন বিব্রত না করলেও শ্রুতিমধুর গান উপহার দেবার ব্যাপারে তাদের উদ্যোগ সফল হল। রেকর্ডের গান আর সিনেমার গানের অন্তর্বর্তী ভেদরেখা অস্পষ্ট রয়ে গেল, শিল্পীরা অবাধে দু'নৌকোয় পা রেখেই ভাসলেন গানদরিয়ায়।

প্লে-ব্যাক চালু হবার পরেও গায়ক-অভিনেতা হ্যাংওভার কাটাতে সময় লেগেছিল সিনেমার। সেদিন কানন দেবী ছিলেন স্বমহিমায়, সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কুন্দললাল সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র দের মতো অভিনেতা এবং পরবর্তীকালের রবীন মজুমদার, অসিতবরণের মতো গায়ক-নায়ক। 'দেবদাস' ছবির নায়ক প্রমথেশ বড়ুয়া গান গাইতে পারতেন না বলে, চন্দ্রমুখীর কোঠায় সায়গলকে বন্ধু হিসেবে যেতে হয়েছিল দর্শককে গান শোনাতে। আর সেই সূত্রে হিন্দি ভাষায় তোলা দেবদাস-এর নায়ক হলেন সায়গল এবং অচিরেই তিনি দেশের প্রথম সিঙ্গিং সুপারস্টার। অভিনেতা হিসেবে সায়গলের যত মার্কস কেটে নেওয়া হয়, মগ্ন গায়ক হিসেবে তিনি গ্রেস হিসেবে গেয়ে যান, তার চেয়ে বেশি মার্কস—এভাবেই তিনি হয়ে গেছেন আইকন।

স্টুডিয়ো সিস্টেম এবং নিউ থিয়েটার্সের রমরমার সেই তিরিশ-চল্লিশের দশকে, রাইচাঁদ বড়াল এবং পঙ্কজ মল্লিক সংগীত নির্দেশনায় শিরোনাম হিসেবে কর্তৃত্ব করলেও, পাশাপাশি কৃষ্ণচন্দ্র দে, হিমাংশু দত্ত ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায় এবং রাগসংগীতের বৃত্ত থেকে তিমিরবরণ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, অনাথনাথ বসু, দক্ষিণামোহন ঠাকুরের মতো শিল্পীরা এসেছেন সিনেমায় সংগীত পরিচালনায়, এই ধারায় পরবর্তীকালে আলি আকবর খান, রবিশঙ্কর, বিলায়েৎ খান, বাহাদুর খান, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মতো দিক্‌পাল সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা ছবির গান। অন্যদিকে অনুপম ঘটক, শচীনদেব বর্মন, সুধীরলাল চক্রবর্তী, রবীন চট্টোপাধ্যায়, কমল দাশগুপ্তর মতো গুণী কম্পোজারেরা জড়িয়ে পড়লেন সিনেমার গানের সঙ্গে। গানের লিরিক লেখবার জন্য তাঁরা পেয়ে গেলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, বাণীকুমার, শৈলেন রায়, প্রণব রায়ের মতো কাব্য-বোধসম্পন্ন লেখকদের। 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে প্লে-ব্যাকের সূত্রে গায়িকা হিসেবে এসেছিলেন কানন দেবী-উমাশশীর উত্তরাধিকারী সুপ্রভা সরকার, এরপর এলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মতো পরবর্তীকালের নামী শিল্পীরা। সবমিলিয়ে আটঘাট বেঁধে শুরু হল সিনেমার গান।

প্লে-ব্যাক প্রথার প্রবর্তনার মাইলফলক, উনিশশো পঁয়ত্রিশের 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে সুপ্রভা সরকার, পারুল বিশ্বাস এবং সহশিল্পীদের গাওয়া 'মোরা পুলক থাকি' গানটি ছিল উচ্ছ্বাসের, এর পাশাপাশি পাহাড়ি সান্যাল গেয়েছিলেন প্রেমের গান 'কেন পরান হল বাঁধনহারা' এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে বিবেকের ভঙ্গিতে গেয়েছিলেন 'পথিক তাকা পিছন পানে'। এভাবে একটি ফর্মূলার জন্ম হল সিনেমার গানে—বিভিন্ন রুচির দর্শকের জন্য একটি বা দুটি প্রেমের গান, একটি দার্শনিক ভাবনা বা জীবনবোধ-বিষয়ক, এর সঙ্গে বিরহ বা দুঃখের গান, হাসির গান, উচ্ছ্বাসের বা ছন্দ্রপ্রধান আনন্দের গান সঠিক অনুপাতে মিশিয়ে দেওয়া। রাগাশ্রয়ী বাঁ ফোক চরিত্রের গানের পাশাপাশি কীর্তন বা ভক্তিমূলক গান এবং পশ্চিমি সুরের নির্যাস মাখানো কম্পোজিশনও পরিবেশন করা হত।

চার পাঁচ বছরের মধ্যেই মুক্তি, দিদি, সাথী, বিদ্যাপতি, জীবনমরণ, পরাজয়, অভিনেত্রী, পরিচয় এমন অতি জনপ্রিয় ছবির হাত ধরে বাংলা ছবির গানের রোল-মডেল তৈরি হয়ে যায়। প্রতি ছবিতে ছটি থেকে আটটি গান—কানন দেবী বা সায়গলের মতো শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের কণ্ঠে এবং এইসব ছবি 'মিউজিক্যাল' হিসেবে বিজ্ঞাপিত হত। মিউজিক্যাল হিসেবে ততদিনে বিদেশে একটি বিশেষ আঙ্গিকের ছবিকে চিহ্নিত করা হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে 'আলিবাবা' ছবিতে তেমন একটি সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এইসব ছবি আসলে সংগীতমুখর বা আরও সঠিকভাবে বলতে হলে ছিল 'গানমুখর'।

সায়গল-কাননের পাশাপাশি পঙ্কজকুমার মল্লিক গাইতেন ছবির গান। 'শাপমুক্তি' ছবির সূত্রে এসেছিলেন রবীন মজুমদার, 'কাশীনাথ' ছবির গানে অসিতবরণ, 'শহর থেকে দূরে' ছবির হাত ধরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'সাত নম্বর বাড়ি'র গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, 'অঞ্জনগড়' ছবির গানে এলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। বাংলা ছবিতে গানমুখরতার এই ট্রেন্ড আজও রকমফেরে বহমান। গান নির্মাতা বা উপস্থাপক বদলে গেছে, গানের তালিম এবং ছবিতে প্রয়োগের ভঙ্গি বদলে গেছে, কিন্তু গানের চাহিদা এবং জোগান আট দশক পেরিয়েও অব্যাহত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবির দাবি হিসেবে গান আসার বদলে, গানের জন্য তৈরি করা হয় সিকোয়েন্স। ফলে তা প্রক্ষিপ্ত অংশ হয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালে সে গান নির্বিশেষে অন্য গানের ভিড়ে মিশে যায়। গানহীন সিনেমা সিংহভাগ দর্শকের কাছেই নুন ছাড়া তরকারি এবং সেই কারণেই মেইনস্ট্রিম সিনেমায় গানহীন ছবি খুঁজতে গোয়েন্দা লাগাতে হবে। যেমন সবাক ছবির

প্রথম দু'দশকের অবকাশে 'ভাবীকাল' (১৯৪৫) এবং 'সরলা' (১৯৫৩) ছবি দুটিতে গান ছিল না। উনিশশো সাঁইত্রিশে ওয়াদিয়ার 'নওজওয়ান' ছবিতে কোনো গান ছিল না, এতে দর্শক এত ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে তড়িঘড়ি একটি ট্রেলার তৈরি করে পরিচালক বিনীতভাবে জানিয়েছিলেন কেন তাদের পক্ষে এই ছবিতে গান রাখা সম্ভব হয়নি। গানহীন ছবি তৈরি সেদিন এমনই ঝুঁকির ছিল। কিন্তু গান সংযোজনায়, ছবির কাছে তেমন দায়বদ্ধতা ছিল না। কোনো ছবি থেকে একটি গান বাদ দিয়ে দিলে কিংবা আরও দুটি গান যোগ করা হলে সিনেমাটির ভারসাম্যে কোনো ব্যত্যয় হত না। অর্থাৎ ছবির জন্য নয়, দর্শকের জন্যই গানের অনিবার্যতা। এবং এভাবেই সিনেমার ওপর গানের ভার চেপেছে, একই সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকমের আবহসংগীত, যার নান্দনিকতা-ব্যঞ্জনা-তাৎপর্য নিয়ে ভাবনা সেভাবে বিব্রত করেনি চিত্রনির্মাতাদের। তারা শ্রুতিমধুর গান শোনাতে চেয়েছেন, প্রেম-বিরহ খুশি বা বিষাদ জড়ানো সিকোয়েন্সে কাব্যধর্মী লিরিক মেলোডিতে সাজিয়ে সুকণ্ঠে পরিবেশন করেছেন। এই গান শুনে দর্শক যেমন খুশি হয়েছে, ছবির পাত্র-পাত্রীরাও ওই গানের সুতো ধরে কখনো-কখনো পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করেছেন, টের পেয়ে গেছেন অনেক না-বলা না-জানা কথা। বিষণ্ণ গানের জন্য ছাদের আলসে, বিরহের গানের জন্য জানলার গরাদ, উচ্ছ্বাসের গানে ফুলদানি এবং ফুল, প্রেমের গানের জন্য পার্ক, গাছপালা-নদীতীর, গাড়ির সিট অথবা মোটরবাইক, দার্শনিক গানের জন্য পথ-ঘাট- মাঠ-আটচালার বারান্দা—এছাড়াও জন্মদিনের-পার্টি, মন্দিরে মূর্তির সামনে নৌকোয় অনেক মধুরগীতি উদ্বেল করেছে। তবে জানলা বা ছাদের পাশাপাশি বিস্তর গানের দৃশ্যে সঙ্গী হয়েছে ভারী পিয়ানো।

মূল ছবির কথা ভুলে গেলেও সেইসব গান অক্ষয় হয়ে গেছে অনেক মনের আর্কাইভে, অলস মুহূর্তে গুনগুন প্রতিধ্বনি তুলেছে, ছায়াছবির গানের জনপ্রিয় আসরে উন্মুখ হয়েছে শ্রবণ। এভাবেই সিনেমার গান, সিনেমার সমান্তরালে একটি ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সিনেমাটা না দেখেও শ্রোতার ফিল্মি গানের রসগ্রহণে অসুবিধে হয়নি। অর্থাৎ একসময় সিনেমার গানে দেখা এবং শোনার যে যৌথ প্ররোচনা উদ্বুদ্ধ করেছিল, ক্রমশ তা অনেকক্ষেত্রেই রেকর্ডের গানের কেবল শ্রবণমাধুর্যের স্তরে নেমে এল। ফলে একদিকে সিনেমার গান, সিনেমার সঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে উপভোগ্য—এটা যেমন গানের জোরের জায়গা, ঠিক একইভাবে গানটির সিনেমা-নির্ভরতা বা সিনেমার গান-নির্ভরতা অবশ্যম্ভাবী রইল না—এটা হয়ে গেল সিনেমার গানের দুর্বলতার জায়গা।

সিনেমার গান নিয়ে এই বিন্দুতে দাঁড়ালে একটি বিভাজন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। চলচ্ছবি চোখে প্রতিবিম্বিত হবার পাশাপাশি শ্রুতিতে যে গান প্রতিধ্বনিত হবে, তাকেই সিনেমার গান হিসেবে ধরলে এদেশে সে গানের বয়েস আশি পেরিয়েছে। এই প্রয়োগের মধ্যেই রয়েছে বিভাজন। সিনেমা-নামক শিল্পরূপটির গঠনে যে সকল এলিমেন্টের মিশ্রণ ঘটে, তেমন একটি জরুরি এলিমেন্ট হিসেবে ছবিতে গান আসতে পারে। গান হিসেবে নিজেকে জাহির করা তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং চলচ্চিত্রভাষার অঙ্গীভূত হয়ে ওঠাতেই সে গানের মোক্ষলাভ। সে গান সিনেমার-চাহিদা এবং ইমেজের অঙ্গাঙ্গী, সেই গান দৃশ্যমাধ্যমে যোগ করে অতিরিক্ত মাত্রা বা ব্যঞ্জনা কিংবা সিনেমার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে তার ভূমিকা অনুঘটকের, তা সিনেমার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে যা সরিয়ে দিলে শিল্পটির অঙ্গহানি ঘটে। সিনেমায় সেই গান কখনো হয়ে ওঠে আবহসংগীত, কখনও সংলাপ বা সুনির্দিষ্ট মেসেজের বাহক, কখনও সে গান স্থান-কাল বা পাত্রের আইডেনটিটির সূচক, কখনও সে গান কোনো অনুষঙ্গ বয়ে আনে অর্থাৎ ইমেজের কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে অন্য কোনো প্রক্রিয়ার চেয়ে গানটি হয়ে উঠতে পারে নান্দনিক বা শৈল্পিক। পরিস্থিতির ওপর 'কমেন্ট' করতে পারে গান। এমন উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে একটি গোটা গান প্রযুক্ত হতেই পারে, তার আঙ্গিক বা গঠনের পূর্ণতা নিয়ে, কিন্তু সিনেমার গানের এমন কোনো বাধ্যতা নেই যে প্রিল্যুড-ইন্টারল্যুড-স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আলাপ-বিস্তার অর্থাৎ লেজামুড়ো সমেত গোটা গানটা ব্যবহার করতেই হবে। গানের একটি কলি—একটি অন্তরা, বা যে-কোনো অংশ সিনেমার কাজে লাগতে পারে। কখনও আস্ত গান সে উদ্দেশ্যসাধনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। সিনেমায় গানের আপাদমস্তক সুরেলা কিন্নরকণ্ঠের পরিবেশনা বা হাই ফাইডেলিটি শব্দধারক উৎকর্ষে পৌঁছোবার কোনো দায় নেই, কথাহীন কোনো চেনা গানের সুরও রিফ্লেক্সকে কাজে লাগাতে সিনেমায় দারুণ ফলপ্রসূ হতে পারে। একাধিক গানের মন্তাজ, ইমেজের মন্তাজের সঙ্গে মিশে সিনেমার পক্ষে আদর্শ হতে পারে। অর্থাৎ ফিল্মের স্বার্থসিদ্ধিতে কোনো গানের ভূমিকা গৌণ অথচ স্বতন্ত্রভাবে সে গান উপভোগ্য, এমন গান 'সিনেমার গান' হিসেবে ব্যর্থ। এই সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা অনুসরণ করে এতাবৎ সিনেমার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিলে যথার্থ সিনেমার গান হিসেবে বহু গানই উঠে আসবে। যার প্রথম উদাহরণ বাংলা ছবির দর্শক পেয়েছেন উনিশশো পঞ্চান্নর ছাব্বিশে আগস্ট—'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো আমারে'। 'পথের পাঁচালী' ছবিতে ইন্দির ঠাকরুন চরিত্রটির ঠোঁটের জন্য তার নিজের-গাওয়া ওই গান 'সিনেমার স্বার্থে' গানের মাইলফলক। সে গানের জন্য পেশাদারি গাইয়ের চাহিদা উঁকি

দেননি, বাদ্যযন্ত্রের অনুপ্রবেশ জরুরি ছিল না, উন্নত শব্দধারণ প্রক্রিয়া অনিবার্য হয়ে ওঠেনি অথচ ছবিতে গানটি এক অমোঘ ভূমিকা পালন করে একটি চরিত্রের থিম মিউজিক হয়ে উঠেছে। ওই গানটি দর্শক একই সঙ্গে দেখেছেন এবং শুনেছেন 'সিনেমার ভাষা'য়। 'আমাদের সিনেমা-সংগীতের সমস্যাটা দৈন্যের নয় প্রাচুর্যের' এমন অভিজ্ঞতায়, প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বয়ে আসা ক্রমবর্ধমান সিনেমা-সংগীতের স্রোতের মুখে বাঁধ দিয়ে সত্যজিৎ তৈরি করে নিয়েছিলেন সিনেমা সংগীতের ভূমি—'সাইলেন্স'। সেই নৈঃশব্দ্যের বুকে একটি নিরীহ বাঁশি, স্ফূর্তিময় সেতার আর নিম্নগামী পাখওয়াজের ধ্বনিময়তায় শুরু হয়েছিল আদর্শ সিনেমা-সংগীত নির্মাণের অভিযান। সেই যাত্রায় নিশ্চিন্দিপুরের মাটির দাওয়া থেকে গানটি ঝরে পড়েছিল অশীতিপর অবহেলিত বৃদ্ধের স্বগতোক্তির মতো।

পরের বছর উনিশশো ছাপান্নয় সিনেমার গান হয়ে উঁকি দিল রাঁচির ধূমকুড়িয়া অঞ্চলের আদিবাসীদের গান, রানি খাটঙ্গো গ্রামের ওঁরাও উপজাতিদের গান, ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ছবিতে। এভাবেই পশ্চিম রাজস্থানের লোকসংগীত 'সোনার কেল্লা' ছবিতে সিনেমার গান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি বালক গুঁইয়ের গাওয়া 'হিদরো-হিদরো তিমরো মন' কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিতে হয়ে উঠেছে সিনেমার গান।

সিনেমা থেকে দূরত্বে আপন তাগিদে সৃষ্ট গানকে কি করে সিনেমার এলিমেন্ট করে তোলা যায় তেমন দৃষ্টান্তও গত অর্ধশতাব্দীর বাংলা সিনেমায় বিস্তর। রবীন্দ্রনাথের গান প্রয়োগ-মহিমায় কীভাবে হয়ে উঠতে পারে সিনেমার গান তার উদাহরণ 'মণিহারা' ছবির 'বাজে করুণ সুরে', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির 'এ পরবাসে রবে কে', 'মেঘে ঢাকা তারা', ছবির 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে' 'গণশত্রু' ছবির 'এখনো গেল না আঁধার', 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ছবির 'কেন চেয়ে আছ গো মা' 'জন অরণ্য' ছবির 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে', 'আগন্তুক' ছবির 'অন্ধজনে দেহ আলো'। শিল্পগুণান্বিত ছবিতে এমন অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। এভাবেই নজরুল ইসলামের গান (সমাপ্তি), অতুলপ্রসাদের গান (অরণ্যের দিনরাত্রি), রামমোহনের ব্রহ্মসংগীত, নিধুবাবুর টপ্পা (চারুলতা), মীরার ভজন (জয়বাবা ফেলুনাথ) দৃশ্যে উপযোগী ব্যঞ্জনা এনে সিনেমার গান হয়ে উঠেছে। 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে এ কাননের গাওয়া হংসধ্বনির দ্রুত বন্দিশ 'লাগি লগন', 'জলসাঘর' ছবিতে সালামত খানের 'মিঞা মল্লার' বা বেগম আখতরের ঠুংরী, 'সুবর্ণরেখা' ছবির 'আলি দেখো ভোর' বা 'আয় মা উমা কোলে লই', 'কোমল গান্ধার' ছবিতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'এসো মুক্ত করো' এই অর্থে গান হিসেবে সিনেমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি ঘটিয়েছে।

গানগুলির নিজস্ব আইডেনটিটি থাকলেও ইমেজের সঙ্গে মিলে দৃশ্যে প্রার্থিত আবেগ আনতে সহায়ক হয়েছে, দৃশ্যে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা এনেছে। সিনেমার জন্য তৈরি গানের প্রসঙ্গ আনলে 'চিড়িয়াখানা' ছবির 'ভালোবাসার তুমি কি জানো' থেকে গুপী বাঘা সিরিজের গান সিনেমার গানের সার্থক নিদর্শন। গুপীর গান এবং সিনেমার গান সমার্থক শব্দ, কারণ এই গানগুলি তৈরি না হলে সিনেমাটাই হয় না।

চলচ্চিত্রের ভাষা নির্মাণে বঙ্গদেশের অগ্রণী চিত্রনির্মাতা এবং সিনেমার কাছে দায়বদ্ধ পরিচালকদের সম্মিলিত অবদানে সিনেমার গানের এই ধারাটি যথেষ্ট পুষ্টি পেলেও এ গান সংখ্যালঘু। সিনেমায় গান বলতে সংখ্যাগুরু শ্রোতা মূলধারার ছবির গানই বোঝেন, অতএব সেই ধারাতেই গা ভাসাতে স্মৃতির সরণি ধরে পিছিয়ে যেতে হয়।

সিনেমার গানের প্রথম পর্ব স্টুডিয়ো সিস্টেমের যুগ, ফলে প্রধানত প্রযোজক নিয়ন্ত্রিত ছিল, আজও লগ্নিকারীদের সে প্রতাপ রয়ে গেছে তবে এর মাঝখানে তৈরি হয়েছে আরও কিছু সমীকরণ। কোথাও পরিচালকের হাতে ক্ষমতা বর্তেছে—যেমন দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া বা নীতিন বসু, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সংগীত পরিচালকের প্রভাব; রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, হীরেন বসু, কৃষ্ণচন্দ্র দে এই ধারার অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। যেমন নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিয়ো কর্তা বীরেন্দ্রনাথ সরকার, দেবকী বসু, রাইচাঁদ বড়াল সকলেরই মতামতের গুরুত্ব ছিল, স্টুডিয়োতে গান নিয়ে প্রায় ওয়ার্কশপ হত, মিলিতভাবে গানের মহিমা বানানোর উদ্যোগ হত। প্রত্যেকেই নিজেদের সেরাটা দিতে চেষ্টা করতেন।

প্লে-ব্যাক চালু হবার পর সংগীত পরিচালকের গুরুত্ব বজায় রেখেছিলেন রাঁইচাঁদ-পঙ্কজের মতো একইসঙ্গে গুণী এবং সফল শিল্পীরা, সেই সঙ্গে গাইয়েদের প্রতাপ শুরু হল। মুক্তি-সায়গল-কানন দেবীকে এক্ষেত্রে টার্নিং পয়েন্ট ধরা যায়। কানন দেবীর উত্তরসূরি হিসেবে সুপ্রভা সরকার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় থেকে আরতি বা লতা-আশা ভগিনীদ্বয় পর্যন্ত গায়িকাদের স্টার সিস্টেম সক্রিয় ছিল। যেমন গায়কদের ক্ষেত্রে সায়গল-পরবর্তী ট্রায়ো ধনঞ্জয়-জগন্ময়-হেমন্ত এবং পরবর্তীকালে মান্না থেকে কিশোরকুমার পর্যন্ত বয়ে এসেছে এই ধারা।

গীতরচয়িতারা, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া চিরকালের লো প্রোফাইল—সেক্ষেত্রে তুলসী লাহিড়ি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ সমকালীন তিন প্রধান ব্যক্তিত্ব অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায় এবং প্রণব রায়—পরবর্তীকালে আর-একটি ট্রায়ো পাওয়া গিয়েছে গৌরপ্রসন্ন-পুলক-শ্যামল গুপ্ত, এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন মুকুল দত্ত।

সংগীত পরিচালনার ক্ষেত্রে রাইচাঁদ-পঙ্কজ-কৃষ্ণচন্দ্র-হিমাংশু দত্তর উত্তরসূরি হিসেবে স্টার স্ট্যাটাস পেয়েছেন অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, কমল দাশগুপ্ত, সলিল চৌধুরী এবং অবশ্যই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তবে পাশাপাশি ছিলেন অনেক গুণী কম্পোজার তিমিরবরণ, শচীনদেব বর্মন, অনিল বাগচি, দুর্গা সেন, গোপেন মল্লিক, কালিপদ সেন এবং আরও অনেকেই।

ছবিতে গান সংযোজনার প্রথম দু'দশকের নথিপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করলে অন্তত চল্লিশ জন গীতিকার এবং পঞ্চাশজন সুরকারের নাম পাওয়া যায় এবং প্রথম যুগের অনেক ছবিতেই সংগীতযোজনার ক্ষেত্রে ক্রেডিট দেওয়া হয়নি। ফলে এভাবে নাম উল্লেখ করতে গেলে অনিবার্যভাবেই কিছু নাম বাদ পড়ে যাবে। ছবির সংখ্যার বিচারে কেউ এগিয়ে, কেউ আবার কয়েকটি ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ কাজের স্বাক্ষর রেখেছেন, ছবি জনপ্রিয় হয়নি বলে অনেক উল্লেখযোগ্য গানই হারিয়ে গেছে, কারও গান সময়কে অতিক্রম করে সোচ্চার। বাংলা ছবিতে কম্পোজারদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রাঁইচাদ বড়াল থেকে সুমন চট্টোপাধ্যায় অন্তত পঞ্চাশজনের কাজ নিয়ে আলোচনা জরুরি, যা এমন একটি নিবন্ধের ধারণক্ষমতার বাইরে। ফলে কিছু টার্নিং পয়েন্ট ছুঁয়ে যাওয়াই বরং কার্যকরী হতে পারে।

উনিশশো একত্রিশের 'জোর বরাত' ছবিতে হীরেন বসুর গানটিকে বাংলা ছবির গানের অভিষেক ধরা হলে, পরের বছরে মুক্তি পাওয়া নিউ থিয়েটার্সের প্রথম সাফল্য 'চণ্ডীদাস' ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্র দের গানকে প্রথম মাইলফলক ধরতে হয়। এই সময়ের অন্যান্য ছবিতে নাট্যগীতি, ভক্তিমূলক গানের ওয়ার্ম আপ পেরিয়ে পঁয়ত্রিশের 'দেবদাস' এবং প্লে-ব্যাকের সূত্রপাত যে ছবি থেকে সেই 'ভাগ্যচক্র' অবশ্যই টার্নিং পয়েন্ট। সাঁইত্রিশ সালের 'দিদি' এবং 'মুক্তি' বাংলা ছবির গানে ভবিষ্যৎ রূপরেখাটি এঁকে দিয়েছিল। এরপর 'বিদ্যাপতি', 'অভিজ্ঞান', 'সাথী', 'অধিকার', 'ডাক্তার', 'জীবনমরণ' 'শাপমুক্তি', 'শেষ উত্তর' বা 'আলেয়া' পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই বাংলা ছবির দর্শকদের গানে মজিয়ে দেবার ব্লু প্রিন্টটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

সেই সময় জনপ্রিয় গানের কোনো টপার চার্ট তৈরি হলে অবশ্যই উল্লেখ হবে যেসব গানের—ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বধূ (চণ্ডীদাস/কৃষ্ণচন্দ্র দে) গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে (দেবদাস/সায়গল) দিনের শেষে ঘুমের দেশে (মুক্তি/পঙ্কজ) কেন পরান হল বাঁধন হারা (ভাগ্যচক্র/পাহাড়ি সান্যাল) সখি কে বলে পিরীতি (বিদ্যাপতি/কানন দেবী) ওগো সুন্দর মনের গহনে (মুক্তি/কানন দেবী), যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন (যোগাযোগ/কানন দেবী) দুঃখে যাদের জীবন গড়া (অধিকার/পঙ্কজ মল্লিক) পাখি

আজ কোন কথা কয় (জীবন মরণ/সায়গল), এ গান তোমার শেষ করে দাও (সাথী/সায়গল), বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে (ছদ্মবেশী/শচীনদেব বর্মন), এই কি গো শেষ গান (গরমিল/রবীন মজুমদার), একটি পয়সা দাও গো বাবু (শাপমুক্তি/রবীন মজুমদার) আমি বনফুল গো/চলে তুফান মেল (শেষ উত্তর/কানন দেবী) কভু যে আশায় কভু নিরাশায় (জীবন মরণ/সুপ্রভা সরকার), রাধে ভুল করে তুই (শহর থেকে দূরে/ধনঞ্জয়), মাটির এ খেলাঘরে (আলেয়া/ধনঞ্জয়), নীলপরী স্বপ্নে (দম্পতি/রবীন মজুমদার) রাজার মেয়ে কাহার লাগি (অসিতবরণ/প্রতিশ্রুতি)...

এমন অসংখ্য গান প্রেক্ষাগৃহ বা গ্রামোফোন রেকর্ড কিংবা রেডিয়ো-বাহিত হয়ে ক্রমশ জড়িয়ে গেছে বঙ্গজীবনের সঙ্গে, শ্রোতারা এইসব গানের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, উদ্বেলিত হয়েছেন, বিষণ্ণ হয়েছেন, কোনো গান বা শিল্পীকে কেন্দ্র করে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, চর্চা করেছেন, গলায় সুর তুলেছেন—সর্বোপরি ছবির গানের প্রেমে পড়েছেন। সিনেমার গানের যখন তিন বছর বয়েস তখন গ্রামোফোন কোম্পানি বাংলা গানের রেকর্ডে 'বেঙ্গলি মডার্ন' লেবেল লাগিয়েছিলেন। যাকে বাংলা অনুবাদে আধুনিক বাংলা গান বলা হয়ে থাকে। এর আগে তিরিশ বছর ধরে বাংলা গানের যে-সব রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে তাকে রাগপ্রধান, ভক্তিগীতি, টপ্পা, আগমনী, বিজয়া, রবিবাবুর গান, কাজীর গান, হাসির গান এমন নানা অভিধা দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই আধুনিক গান সময়োপযোগিতা, আঙ্গিক, ভাবনা বা উপস্থাপনা কোনদিক থেকে কতটা 'আধুনিক' সে প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখেই নজরুল-উত্তর কম্পোজারদের গান হয়ে উঠেছিল আধুনিক গান।

দুটি বিষয় এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, এর আগে কথায়-সুরে মেলবন্ধন ঘটানোর কাজটি যেমন এককভাবে করতেন অনেক কম্পোজার, সেক্ষেত্রে দায়িত্ব বিভাজন প্রকট হল। গীতিকার-সুরকার, গায়ক-গায়িকা এবং সংগীতায়োজক সম্মিলিতভাবে একটি গান নির্মাণের দায়িত্ব নিলেন, অন্যদিকে সৃষ্টির আনন্দে গান নির্মাণের ধারা, যার ওপর বড়ো থাবা বসিয়েছিল রেকর্ডের গান, সিনেমার গান তাকে আরও উসকে দিল। পেশাদার শিল্পী খুঁজে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে গানের বিনোদনী বাজার তৈরি হয়ে উঠল প্রধান উদ্দেশ্য। সিনেমায় যেহেতু শোনবার সঙ্গে দেখবার ব্যাপারটা যোগ হল, সেক্ষেত্রে সিনেমার গানের প্রভাব গেল বেড়ে। 'মুক্তি' ছবিতে গারো পাহাড়ের কোলে সরাইখানার মালিক সেজে পঙ্কজ মল্লিক অমন পরিশীলিত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সারগর্ভ লিরিক 'দিনের শেষে' সুর করে গাইলেও দর্শক লজিককে গুরুত্ব না দিয়ে গানেই মুগ্ধতা খুঁজেছে। দ্বিতীয়ত 'আধুনিক' সিনেমা ও গানে প্রথম এবং

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে কোনো আঁচড়ই প্রায় পড়েনি। ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক ছবির পাশাপাশি সামাজিক বিষয় নিয়ে তৈরি ছবির সংখ্যা বেড়ে গেলেও গান রয়ে গেল দর্শক ভোলানোর অন্যতম অস্ত্র। বিষয় হিসেবে সিনেমায় এল অসম অর্থনৈতিক পটভূমির সূত্রে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে সংকট, প্রেমে বা দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, নারীর ত্যাগী-সহিষ্ণু-পতিব্রতা ইমেজ, মৃত্যুতেই শাপমুক্তি ইত্যাদি নানা টানাপোড়েনের নাটকীয় অবতারণা, বিস্তর চোখের জলের মাঝখানে গান হয়ে উঠল রিলিফ।

জানলায়-ছাদে-পিয়ানোর সামনে, গাছের ছায়ায়, জলসায়, জন্মদিনে, রেডিয়োতে বা গুরুর কাছে শিক্ষাকালে গায়ক-গায়িকা বিবেকের মতো পার্শ্বচরিত্রের গাওয়া সাড়ে তিন মিনিটের গান ছবির ভেতরে বা আলাদাভাবেও হয়ে উঠল সংগীতপ্রেমীর সঙ্গী। উনিশশো বিয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ, জাতীয় জীবনে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, ধর্মঘট, অত্যাচার-কারাগার-দমননীতির প্রাবল্য, তখনও সিনেমা গাইছে 'রাধে ভুল করে তুই চিনলি নারে প্রেমিক শ্যামরায় ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়', 'নীলপরী স্বপ্নে', 'ফেলে আশা দিনগুলি মোর', 'অনাদিকালের স্রোতে ভেসে' ইত্যাদি এবং দর্শক সে গানে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। সেইসব গান আজও অনেক প্রবীণের কাছেই আসল সিনেমার গান বা সোনালি যুগের গান।

স্বাধীনতা-জনিত স্বস্তি বা আত্মতৃপ্তির পর জাতীয় জীবনের মতোই বাংলাগানের শরীরে-মনে বেড়ে গেছে এই অলস রোম্যান্টিসিজম কল্পনাবিলাস। সিনেমার গান তাকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে। সেইসব গানের অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল শ্রুতিমাধুর্য এবং তার আবেদন ছিল মূলত আবেগের কাছে। মেধাকে বিব্রত না করেই সে গান ঢুকে গেছে মনের ঘরে। সিনেমার গানের প্রশস্ত বাজার, অধিক প্রচার এবং বাণিজ্যিক সাফল্যের সূত্র ধরে বাংলা গানের নির্মাণে সক্রিয় অধিকাংশ শিল্পীব্যক্তিত্বই অংশ নিয়েছেন ছায়াছবির গানে, এসেছেন হেমন্ত-সন্ধ্যা-প্রতিমা-উৎপলা-আলপনা-শ্যামল-মানবেন্দ্র-সলিল চৌধুরীর মতো গুণী কম্পোজার, সমৃদ্ধ হয়েছে সিনেমার গান। ভিস্যুয়ালের মদত পেয়ে ফিল্মি গানের চাহিদা এবং প্রভাব ক্রমশ বেড়েছে। সিচ্যুয়েশন ভেবে তৈরি কিছু গান ছাড়া ফিল্মি বা নন-ফিল্মি গানের চরিত্রে সেই অর্থে কোনো ভেদরেখা স্পষ্ট নয়, তবে সিনেমার গানে 'ডুয়েট' হয়ে উঠেছিল একটা জোরের জায়গা। বিশেষত প্রেমের গানে যুগল গীতের গড়ে তোলা রোম্যান্টিক হাতছানি দর্শক-শ্রোতার কাছে হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয়। কানন দেবী-সায়গলের গড়ে দেওয়া রোম্যান্টিক ডুয়েটের রাজপথ পরম্পরায় এগিয়েছে হেমন্ত, সন্ধ্যা থেকে

কিশোর-আশা পর্যন্ত নানা জুটির ডুয়েট গানে। এদের মধ্যে অভিনেতার সঙ্গে গাইয়ের জোটের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে হেমন্ত-সন্ধ্যা জুটি কালোত্তীর্ণ হয়েছেন, তবে সেক্ষেত্রে রয়েছে অন্য সমীকরণ।

গত শতকের পাঁচের দশক বাংলা তো বটেই ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রেও রেনেসাঁ ঘটেছে। বিশ্বমানচিত্রে এর আগেই সিনেমা মাধ্যমটি পেয়েছে নিজস্ব ভাষা। গ্রিফিথ সাহেব আইজেনস্টাইন থেকে 'নুভেল ভগ' এই শক্তিশালী মাধ্যটিকে নিয়ে চলেছে নানান নিরীক্ষা। ভারতীয় ছবিতে তার ছোঁয়া লেগেছে পাঁচের দশকে। দেবকী বসু থেকে বিমল রায় ভিড়ের ভেতরেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশে উদ্যোগী কয়েকজন চিত্রনির্মাতার সক্রিয়তার সূত্র ধরে একান্ন সালের 'ছিন্নমূল' (নিমাই ঘোষের ছবি) ছবিতে উদ্বাস্তুদের উঠে আসা বা 'নাগরিক' (ঋত্বিক ঘটকের ছবি) কলকাতায় রেনোয়ার সুটিং এইসব অভিঘাত পেরিয়ে সত্যজিৎ রায়ের অনিবার্য উত্থান। সত্যজিৎ-ঋত্বিক সিনেমায় গান প্রয়োগের একটি ধারা তৈরি করেছিলেন যা সিনেম্যাটিক হয়ে ওঠার প্রতি নিবিষ্ট, পরবর্তীকালে মৃণাল সেন গান প্রয়োগে সংযমী একটি ধারার প্রতিভূ। অন্যদিকে তপন সিংহ, তরুণ মজুমদারের মতো পরিচালক পরিচ্ছন্ন ছবিতে পরিমিত বা ভারসাম্যে গান ব্যবহারে উদ্যোগী, পরবর্তীকালের শিক্ষাগুণান্বিত ছবির নির্মাতারা এই তিনধারার যে-কোনো একটির অনুসারী।

অন্যদিকে মূলধারার ছবিও সেই 'পথের পাঁচালী'র বছরেই গান প্রয়োগের ক্ষেত্রে টার্নিং পয়েন্ট হয়ে উঠল, সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী 'ইউ' ফ্যাক্টর। 'শাপমোচন' ছবি থেকে এই 'ইউ' বা উত্তমকুমার ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছিল অন্যতম চালিকাশক্তি। উনিশশো পঞ্চান্ন থেকে আশি—পঁচিশ বছরের বাংলা সিনেমার গানের নিউক্লিয়াস হয়ে উঠেছিলেন উত্তমকুমার। এইসময় উত্তম-বিহীন অসংখ্য ছবিতে বিস্তর জনপ্রিয় এবং প্রভাববিস্তারী গান শোনা গেছে, উত্তমের গানের তুলনায় তার সংখ্যা বহুগুণ বেশি, কিন্তু নায়ক হিসেবে উত্তমের ইমেজ, গানের দৃশ্যে তাঁর স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি লিপ সিঙ্ক, দর্শকের গ্রহণযোগ্যতা সবমিলিয়েই উত্তম ওই সময়ের অভিনেতাদের সঙ্গে গানের সেতুনির্মাণে রোল মডেল। উত্তমকুমার আছেন মানেই উপভোগ্য গান থাকবে, তার নায়িকারা আবেশ ছড়ানো গান গাইবেন ধরে নেওয়া হত। গানবাজনার সঙ্গে কিঞ্চিৎ যোগাযোগ থাকার ফলে উত্তমকুমার বাড়তি সুবিধে পেয়েছেন, আর রোম্যান্টিক চরিত্রে তিনিই ছিলেন দর্শক পসন্দ।

মুম্বাইয়ে এমন ট্রেন্ড থাকলেও, গায়ক-নায়ক জুটির ক্ষেত্রে উত্তম-হেমন্ত বাংলা ছবির একমাত্র 'মিথ', আর উত্তম-সুচিত্রা মিথের ক্ষেত্রে সুচিত্রা সেনের সঙ্গে মিলে

গেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। বাণিজ্যিক বাংলা ছবিতে উত্তম-সুচিত্রার জন্য হেমন্ত-সন্ধ্যার বিস্তর গান থাকলেও এদের ডুয়েটের সংখ্যা সে তুলনায় নগণ্য। কিন্তু দু'জনের একজন গাইলে, অন্যজনের গানের আকাঙ্ক্ষা জাগে দর্শকের—এটাই ম্যাজিক। উদাহরণ হিসেবে উত্তম-সুচিত্রা জুটির রোম্যান্টিক ডুয়েটের একটি উদাহরণ আনা যায়—'এই পথ যদি না শেষ হয়' প্রায় রূপকথা হয়ে যাওয়া এই গানটিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে লিরিকের একটি বাক্যও উচ্চারিত হয়নি, 'শুধু তুমি বলো' এবং 'লাল্‌লা লা লা' উচ্চারণেই তিনি বাজিমাত করে দিয়েছেন। উত্তম-সুচিত্রার তৈরি এই জমিতে উভয়ের জায়গায় বিশ্বজিৎ-অনিল চ্যাটার্জি-সৌমিত্র বা প্রসেনজিৎ—অন্যদিকে সুচিত্রার জায়গায় সাবিত্রী-সুপ্রিয়া-মাধবী-অপর্ণা বা দেবশ্রী কিংবা ঋতুপর্ণা থাকলেও গানে ওই রসায়ন ঘটানোরই চেষ্টা চলেবে। যার ফলে ষাটের দশকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হিন্দি গানের রমরমার সময়েও বাংলা সিনেমা-গান নিজস্ব বলয় তৈরি করতে পেরেছিল।

উত্তমকুমারের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাব সিনেমার গানে এতটাই ছিল যে তার জন্য গান গেয়েই প্লে-ব্যাক গাইয়েদের উত্থান ঘটেছে। দীর্ঘদিন হেমন্ত, মাঝেমধ্যে শ্যামল মিত্র, উত্তরকালে মান্না দে এবং এমনকি কিশোরকুমার—বাংলা ছবিতে সকলেরই সাফল্যের সিঁড়ি হয়েছেন উত্তমকুমার। অথচ কী আশ্চর্য, বাংলা ছবির গানেও যিনি নায়ক-প্রতিম, তিনি যে ছবিতে নিজের চরিত্রেই অবতীর্ণ, সেই 'নায়ক' ছবিতে উত্তমকে গান গাইবার সুযোগ দেননি সত্যজিৎ রায়। তবে জীবনের শেষ ছবিতে, পঞ্চাশোর্ধ প্রৌঢ়ের ভূমিকায় অভিনয় করানোর সময়ও উত্তমস্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল অন্তত হাফ ডজন গান, সে গানও দর্শকসমাজে পেয়েছে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা।

সিনেমার গানে উত্তমকুমার যতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠুন, তিনি ছিলেন ভিস্যুয়াল ফ্যাক্টর, সেক্ষেত্রে সিনেমার 'সঙমেকার'দের কৃতিত্বই মূলধন। সেই অডিয়ো ফ্যাক্টরের কারিগর হিসেবে গাইয়ে-গীতিকার-সুরকার-সংগীতাযোজকদের এক আশ্চর্য সমাহার ঘটেছিল পঞ্চাশ-ষাটের দশকে। তখনও রাঁইচাঁদ-পঙ্কজ সক্রিয় 'উদয়ের পথে' বা 'রাইকমল'-এর মতো মেজর কাজ আসছে তাঁদের আস্তিন থেকে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় উত্তমগীতির সুরকার-গায়ক হিসেবে শীর্ষে, 'সাগরিকা' ছবির গায়ক শ্যামল মিত্র, 'দেয়া নেয়া' ছবিতে গায়ক-সুরকার, 'অমানুষ', 'আনন্দ আশ্রম' ছবিতে সংগীত পরিচালক, রবীন চট্টোপাধ্যায় উত্তম-কেন্দ্রিক সিনেমার প্রথমার্ধে যেমন অগ্রণী ভূমিকায় নিয়েছেন সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালের দু'জন কাণ্ডারি নচিকেতা ঘোষ এবং সুধীন দাশগুপ্ত। এঁরা

পাশাপাশি অন্য ছবিতেও সুরের অফুরান বৈচিত্র্য ছড়িয়েছেন। যেমন অনুপম ঘটক উত্তম-সুচিত্রার 'অগ্নিপরীক্ষা'য় কালোত্তীর্ণ কম্পোজিশন করেছেন আবার 'শাপমুক্তি' ছবিতেও তিনি নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন। অনিল বাগচি 'কবি' ছবিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গানে মুনশিয়ানার দৃষ্টান্ত রেখে উত্তমকুমারের 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবিতে সুরের ফুল ফুটিয়েছেন। রাইচাঁদ-পঙ্কজ মল্লিকের পরবর্তী ট্রেন্ডসেটার কমল দাশগুপ্তর 'শেষ উত্তর', 'যোগাযোগ', 'গরমিল' এবং সুবল দাশগুপ্ত 'শহর থেকে দূরে' এবং 'আলেয়া' ছবির সূত্রেই বিখ্যাত। রাজেন সরকার নামটি এলেই তাঁর মাইলফলক 'ঢুলি' ছবির গানের কথা মনে পড়ে। সলিল চৌধুরী মুম্বাইয়ে অধিক বিনিয়োগ করলেও তার 'পাশের বাড়ি' থেকে 'মর্জিনা আবদুল্লা' বা 'কবিতা' পর্যন্ত বাংলা ছবিতে অনেক মনোরম কম্পোজিশন রেখেছেন। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেমন 'মায়ামৃগ' থেকে 'জয়জয়ন্তী' কম্পোজার হিসেবে বৈচিত্র্যপূর্ণ গানের স্রষ্টা।

সব মিলিয়ে চালচিত্রটা দাঁড়াল প্লে-ব্যাক প্রথা প্রচলনের সূত্র ধরে পরবর্তী তিন দশক বাংলা গানের শ্রেষ্ঠ সুরকার-গীতিকার-গাইয়েদের এক বিশাল শিল্পীগোষ্ঠী সিনেমার গানকে সমৃদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিলেন, যার মধ্যে অনেকেই ট্রেন্ডসেটার হিসেবে চিহ্নিত। চিত্রনির্মাতারা এদের সামনে গল্পের ফাঁকে সিচ্যুয়েশনের সঙ্গে মানানসই গান তৈরির দায়িত্ব দিয়েছেন, তাদের কাজ করবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এইসব গানের প্রয়োগ ছবির ক্ষেত্রে কতটা লজিক্যাল বা সিনেম্যাটিক এ প্রশ্ন বড়ো হয়ে ওঠেনি, দর্শকও তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। ফলে প্রেমের গানের ক্ষেত্রে, রাধাকৃষ্ণর প্রেম অনুসরণে পূর্বরাগ-অনুরাগ-বিরহ-দ্বন্দ্ব-মান-অভিমান থেকে মিলন, এমন নানা মেজাজের গানের সঙ্গে, অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের পাশাপাশি হাস্যরস ভক্তিরস ইত্যাদি সম্ভাব্য অনুভব উদ্রেককারী গান লিখেছেন গীতরচয়িতারা, তাতে খেয়ালের বন্দিশ, রাগাশ্রয়ী মেজাজ, ঠুঙরী-গজল-দাদরা থেকে ভজন-কীর্তন-শাক্তগীতি বা বাউল-ভাটিয়ালি-ঝুমুর, সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ পশ্চিমি সুরের নির্যাস প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করে ছন্দে-আনন্দে-মেলোডি-হারমনিতে সাজিয়েছেন সুররচয়িতারা, সেইসব সুরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছেন কুশলী শিল্পীরা। গান হিসেবে ওইসব কম্পোজিশনকে উৎকর্ষে পৌঁছে দিতে সঙ-মেকাররা বারবার মতবিনিময় করেছেন, সংস্কার-পরিমার্জনা করেছেন, দীর্ঘ মহলা দিয়েছেন সময়ের কার্পণ্য না করে গানের সঠিক উপস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। গাইয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন নিষ্ঠা-আন্তরিকতা, নিজের সেরা জিনিসটি দেবার সংকল্প এবং ক্রমিক অনুশীলনে। গানের উৎকর্ষ এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনা মাথায় রেখে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে

কিংবদন্তী লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে বা কিশোরকুমারের মতো শিল্পীদের বাংলা ছবির গানে আহ্বান জানিয়েছেন বাংলা ছবি। সবমিলিয়ে শ্রবণসুখের উপকরণ হয়ে উঠেছে ওই পর্বের অসংখ্য গান।

প্রবীণ প্রজন্মকে স্মৃতিবিধুর করে তোলে চণ্ডীদাস, মুক্তি, জীবনমরণ, সাপুড়ে, ডাক্তার, সাথী, শাপমুক্তি, শেষ উত্তর, আলেয়া বা শ্রী তুলসীদাসের মতো ছবির গান, পরবর্তী প্রজন্ম মুগ্ধ শাপমোচন, অগ্নিপরীক্ষা, উদয়ের পথে, ডাক হরকরা, সাগরিকা, সবার উপরে, লালুভুলু, দেয়া নেয়া, মায়ামৃগ বা মণিহারের মতো ছবির গান, কেউ আবার অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, শঙ্খবেলা, লুকোচুরি, পলাতক, জয়জয়ন্তী, চিরদিনের, তিন ভুবনের পারে, প্রথম কদম ফুল, স্ত্রী বা সন্ন্যাসী রাজার মতো ছবির গানে উদ্বেল হন, কারও পছন্দ ফরিয়াদ, মৌচাক, অনুসন্ধান, অমানুষ, ছদ্মবেশী, বসন্ত বিলাপ বা একান্ত আপন-এর মতো ছবির গান। কারও কাছে যদুভট্ট, বসন্ত বাহার, কমললতা, কবি বা অমর-গীতি ছবির গান নিজস্ব রুচি অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ।

এভাবেই পরম্পরায় বাংলা সিনেমার গানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন দর্শক-শ্রোতা। বহু ছবির গানের দৃশ্যটি বিবর্ণ হয়ে গেছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে রাখেননি দর্শক, কিন্তু ভেতরবাড়িতে এনগ্রেভ হয়ে আছে গানটি, বা গানের দুটো-চারটে কলি। লিরিক বা সুরের সামান্য হেরফের হলেও অনেকেই তাদের প্রিয় গান মনে করতে পারেন, আপনমনে গুনগুন করেন বা গানটি অন্য সূত্র থেকে ভেসে এলে কান পাতেন, স্মৃতিমেদুরতায় আক্রান্ত হন। এমনকি প্রিল্যুড বা ইনটারল্যুড শুনেও অনেকে গানটিকে শনাক্ত করতে পারেন। এর পাশাপাশি রয়েছে প্রিয় ছবি, প্রিয় নায়ক-নায়িকা, প্রিয় গায়ক-গায়িকা সম্পর্কিত অনুষঙ্গ। সিনেমার গানের এই সামগ্রিক প্রভাব অনস্বীকার্য এবং পরিবেশ ও পরম্পরা এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

বাহাত্তর বছর আগের বাংলা ছবির গান, 'আমি বনফুল গো' আজও হারিয়ে যায়নি, ষাট বছর আগের 'ত্রিবেণী তীর্থপথে কে গাহিল গান' গানটির কদর কমেনি, প্রায় ষাট বছর আগের 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' আজও বেশ তরতাজা, অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে আসা এমন অনেক গানই আজকের প্রজন্মের কাছে আদিম চিত্রগীতি বলে মনে হয় না, অনেকেই সে গান গুনগুন করে অথচ আজকের বাংলা ছবির গান দু'দিনেই লোকে ভুলে যাচ্ছে দু'চারটি গানের স্থায়ী বা মুখড়া গুনগুন করলেও অন্তরার খোঁজ রাখে না, এমন অভিযোগ ওঠে। অর্থাৎ সেদিনের গানে মন ভরানোর যথেষ্ট পোটেনশিয়াল ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল 'সেই সময়'—যখন আজকের

তুলনায় গান শোনবার সুযোগ ছিল সীমিত; ঘরে ঘরে রেকর্ড প্লেয়ার, আইপড, নেট বা অষ্টপ্রহরের গণ্ডা গণ্ডা এফ. এম, এত মিউজিক চ্যানেলও ছিল না। ফলে গান শোনার তীব্র আন্তরিক আগ্রহ ছিল এবং আরও বড়ো কথা অবকাশ ছিল। গ্রামোফোন বা চেঞ্জারে গালার রেকর্ড ঘিরে গান শোনার উন্মাদনা ছিল, রেডিয়ো থেকে প্রচারিত ছায়াছবির গানে সবান্ধব কান পেতে শ্রবণসুখ ভোগ করে নেবার প্রবণতা ছিল, জলসায় শিল্পীদের কাছে চিরকুট পাঠিয়ে নতুন ছবির গান 'লাইভ' শোনবার উত্তেজনা ছিল, পালা-পার্বণে অ্যামপ্লিফায়ার থেকে ভেসে আসা সিনেমার গান শুনে থমকে দাঁড়াবার বা মনোযোগী হবার প্রণবতা ছিল, গান শুনে উদাস হবার মতো স্পেস ছিল। আজকের মতো গান গতিময়-জীবনের আবহসংগীত ছিল না। জীবনের জটিলতা কম ছিল, বিনোদনের বিচিত্র মাধ্যম মুহুর্মুহু কড়া নাড়ত না। আজ এই ফাস্ট ফুড এবং টুয়েনটি ফোর ইনটু সেভেনের যুগে অর্ধশতাব্দী আগের মতো, গান আগলে বসে থাকার পরিসর সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

জীবনের মতো গানও থেমে থাকে না, পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক-ব্যবহারিক নানা রোদ-জল-আলো-ছায়া-যন্ত্রণা-সংকটের উত্তাপ বা ঘর্ষণে তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সত্তরের মাঝামাঝি থেকে বাংলা সিনেমার গানের ধারাবাহিকতায় বেসিক বাংলা গানের মতোই ক্রমশ দিশাহারা-গতিহারা চরিত্র ছায়া ফেলেছে।

প্রথমত সিনেমার চরিত্র ক্রমশ বদলে গেছে, পরিবেশের প্রভাবে বদল ঘটেছে দর্শকের মেজাজেও, সর্বভারতীয় ছবির প্রভাবে ক্রমশ ছবি এবং গানের নির্মাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বঙ্গজ সেন্টিমেন্ট, গুণী গান নির্মাতা এবং শিল্পীরা প্রবীণ হয়েছেন, অধিকাংশ নক্ষত্রই হয় প্রয়াত অথবা অন্তরালবর্তী, আর যারা সক্রিয় থেকেছেন তারা নতুন কিছু করবার ঝুঁকি না নিয়ে পুরোনো আঙ্গিকেরই দুর্বল কাঠামো তৈরি করেছেন। ফলে অতীত চিত্রগীতির মহিমাকীর্তন পুষ্টি পেয়েছে। এবং সেদিনের গানের চাহিদা আজও অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। এখানে আর-একটি অঙ্ক রয়েছে, পরিবার বা অগ্রজদের সূত্র ধরে আরও অনেক অতীত মহিমার সঙ্গে পরিচিত হবার মতো, অতীত দিনের গান বা শিল্পীদের সম্পর্কে আগ্রহ জন্ম নেয় নতুন প্রজন্মের। পরম্পরায়, অতীতের সংগীত সংগ্রহের ওপর অধিকার জন্মায় তাদের, এভাবে পুরোনো গানের সঙ্গে একধরনের সম্পর্ক জন্ম নেয় নতুন শ্রোতার। শৈশব-কৈশোরের এই অনুরাগ যৌবনে এসে আড়ালে থাকে, তখন তারা সাম্প্রতিকের কাছে কান পাতে, কিন্তু সমকালীন গানের উন্মাদনার রেশ ক্ষণস্থায়ী হলে শ্রবণজনিত ক্লান্তি দূরীকরণে অনেকেই অতীতের কাছে

অতীতের বাংলা ছবি বর্তমানকে তেমন করে না টানলেও, পপ-প্রেমী আজকের প্রজন্ম যে অতীতের সিনেমার গান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি তার বিস্তর দৃষ্টান্ত সমকালের বুকে ছড়িয়ে আছে। নতুন সিনেমার গানের তুলনায় পুরোনো দিনের গানের বিক্রি অনেক বেশি, এমনকি নতুন শিল্পীদের তুলনায় দুর্বল কণ্ঠে অতীতের চিত্রগীতির রিমেক বা রিমিক্স আজকের শ্রোতারা পছন্দ করে বলেই তার পরিমাণ বেড়েছে। জলসা বা টিভি শো কিংবা এফ. এম-এ পুরোনো দিনের গানই সিংহভাগ। ডাউনলোড করে গান শুনতে আজকের প্রজন্মও হেমন্ত, মান্না, কিশোর, সন্ধ্যা, লতা, আশার গানই বেশি শোনে। পুজো-পার্বণের অ্যামপ্লিফায়ারে আজও পুরোনো দিনের গানই বেশি শোনা যায়। পুরোনো মানে সায়গল-কানন দেবী হয়তো নয়, কারণ সে গান সুলভ নয়, কিন্তু পঞ্চাশ-ষাটের দশকের পপুলার গান নানা মাধ্যমের সূত্রে এই প্রজন্মের কাছে তেমন অপরিচিত নয়।

গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু, এ শুধু গানের দিন, এই দুনিয়ায় ভাই সব সত্যি, তোমার শেষ বিচারের আশায় আমি বসে আছি, ও বকবক বকম বকম পায়রা, সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা, আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা, মৌ বনে আজ মৌ জমেছে, এক পলকের একটু দেখা, এই রাত তোমার আমার, তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ, ও নদীরে, এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়, জীবন খাতার প্রতি পাতায়, কে যেন গো ডেকেছে আমায়, কে প্রথম কাছে এসেছি, আমি যে জলসাঘরে, বড়ো একা লাগে এই আঁধারে, মানুষ খুন হলে পরে, হয়তো তোমারি জন্য—গত শতকের পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের চোদ্দো বছর সময়কাল থেকে বেছে আনা কুড়িটি গান; এই গানগুলো এই প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে তেমন অপরিচিত নয়, এর সবচেয়ে সাম্প্রতিক গানটি পঁয়তাল্লিশ বছর আগের বাংলা ছবির গান।

বাংলা সিনেমায় একদা তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্রর মতো গদ্যকার এবং কবিদের লেখা গানে লিরিকের পোটেনশিয়াল ছিল। অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, প্রণব রায়ের মতো কাব্যবোধ-সম্পন্ন গীতরচয়িতারাও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন গানের ভাবনা এবং শব্দচয়নে, পরবর্তীকালে গৌরীপ্রসন্ন, শ্যামল গুপ্ত এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গানের ভাবনায় আধুনিক মেজাজ আনবার ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছেন। তবে গৌরীপ্রসন্ন এবং পুলক অতিপ্রসবের সূত্রে পরবর্তীকালে নিজেদের পূর্ব মান বজায় রাখতে পারেননি। শ্যামল কম লিখেছেন। মুকুল দত্তর কিছু গানে সহজিয়া আবেদন পাওয়া গেছে, তবে অতীতের বাংলা ছবির গানের আসল জোরটা ছিল সুরের জায়গা।

সময়ের সঙ্গে আধুনিক চিন্তাভাবনা যেভাবে কবিতা বা চিত্রকলায় পড়েছে বাংলা গানের লিরিকে তেমন ঘটেনি, ফলে গানের শরীরে কোনো মৌলিক পরিবর্তন গোচরে আসে না। বাংলা গানের লিরিকের এই দৈন্য সিনেমার গানেও প্রতিফলিত, ক্রমশ ক্লিষ্ট এবং তাৎপর্যহীন হয়ে উঠেছে গানের লিরিক। সুরের বৈচিত্র্য এবং সমৃদ্ধি ছবির গানকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে সেই প্লে-ব্যাকের সূত্রপাত থেকেই।

রবীন্দ্রানুরাগী রাইচাঁদ-পঙ্কজ যুগেই হিমাংশু দত্ত রাগাশ্রয়ী এবং পশ্চিমি সুরের ছোঁয়ায় ছবির গানে এনেছিলেন অন্য মেজাজ। কমল দাশগুপ্ত কাব্যগীতির ওপর ঠুমরী-গজলের ছায়া মাখা নকশা বুনেছেন, কৃষ্ণচন্দ্র দে উদ্দীপক রাগাশ্রয়ী সুর এবং কীর্তনাঙ্গের প্রভাব ছড়িয়েছেন গানে, রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে আবেগ ছড়ানো মেলোডি, সলিল চৌধুরীর সুরবিহারের স্ফূর্তিতে পশ্চিমি নির্যাস, নচিকেতা ঘোষের সুরের নাট্যগুণ, সুধীন দাশগুপ্তর ফোক থেকে ওয়েস্টার্ন ট্রিটমেন্ট এসে মিলেছে ছায়াছবির গানের মোহনায়। আরও বহু কুশলী সুরকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন সুররচনায়। বাংলা ছবিতে সবচেয়ে বেশি সংগীত পরিচালনার কৃতিত্ব যাঁর সেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রানুসারী প্রবণতা এবং সুরে সরল মাধুর্যের পাশাপাশি, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরমিশ্রণের নিরীক্ষা, শ্যামল মিত্র-র আধুনিক মেজাজ নেশা ধরিয়েছে দর্শক-শ্রোতার মনে। সায়গল-কানন দেবীর সহজাত কণ্ঠমাধুর্য, পঙ্কজ মল্লিক এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্বর্ণকণ্ঠ, কৃষ্ণচন্দ্র দে-র উদাত্ত কণ্ঠ বা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, প্রতিমা, গীতা দত্ত শ্যামল মিত্র-র মতো শিল্পী সেইসব সুরবৈচিত্র্য বিঁধিয়ে দিয়েছেন শ্রোতার মনে।

একসময় বাংলার শিল্পীরা বোম্বাইয়ের ফিল্মি সংগীতের ভিত্তি নির্মাণে সামর্থ্য বিনিয়োগ করেছেন, বাণিজ্যিক তাগিদে উত্তরকালে বোম্বাইয়ের কাছে হাত পেতেছিল বাংলা সিনেমা। শচীনদেবকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বাংলা সিনেমা কার্পণ্য দেখিয়েছিল, দুঃখ-অভিমান বুকে নিয়ে তিনি আরব সাগরের তীরে ফিল্মি গানের সুররচনার সূত্রে ট্রেন্ডসেটার হয়েছিলেন, তাঁর পুত্রকে বাংলা ছবি আমন্ত্রণ জানাল মুম্বাইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মডার্ন কম্পোজার রাহুলদেব, বাংলা ছবির গানে নিজস্ব ঘরানার প্রতিফলন ঘটিয়ে সাফল্য পেয়েছিলেন। এর আগে থেকেই প্লে-ব্যাক গাইয়ের ক্ষেত্রে আলটিমেট লতা মঙ্গেশকর-আশা ভোঁসলে, কিশোরকুমার বাংলা সিনেমার গানে সক্রিয়। অতি সাধারণ মানের গানকেও শ্রুতিমাধুর্য দেবার ব্যাপারে এঁদের অবিসংবাদী মুনশিয়ানা, অসংখ্য গানে তারা এই কাজটি করেছেন, সেই সঙ্গে দিয়েছে অনেক মনভরানো গান।

এদের সামনেই বাংলা ছবির গানে ক্রমশ দৈন্যের চিহ্ন প্রকট হতে থাকে। একদিন যে গানে সুরের উৎসব পালন হত, তা ক্রমশ চটুল ছন্দ, যন্ত্রসংগীতের বাড়াবাড়ি, মুম্বইয়ের অনুকরণ, দুর্বল বিষয় ভাবনা, কাব্যগুণ বর্জিত শব্দসম্ভার নিয়ে ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু ছবির সংখ্যা তো হ্রাস পেল না। জোগান চাই, যে-কোনোপ্রকারে, চাহিদা পূরণ হয়ে উঠল উদ্দেশ্য, গানের উৎকর্ষের বদলে সিনেমার দাবি হল যে-ভাবেই হোক অন্তত একটা 'হিট' চাই। পপুলার ট্রেন্ড এবং সফল শিল্পীদের ওপর বাজি ধরা চলল, অতিরিক্ত বাহির নির্ভরতায়, ঘরের শিল্পীরা রইল উপেক্ষিত। গান নির্মাণে যত্ন-অনুরাগের অনটন প্রকট হয়ে উঠল, 'হিট'-এর বদলে 'মিস'-এর সংখ্যা বেড়ে চলল। একদিন যে বাংলা ছবির গান পরম মমতায় আঁকড়ে ধরত দর্শক-শ্রোতা—ওরে পথিক তাকা পিছন পানে (ভাগ্যচক্র), দিনের শেষে ঘুমের দেশে (মুক্তি), রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা (পরশমণি), দুঃখে যাদের জীবন গড়া (অধিকার), চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে (ডাক্তার), এই কি গো শেষ গান (গরমিল), যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন (যোগাযোগ), মাটির এ খেলাঘরে (আলেয়া), গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই (উদয়ের পথে), বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে (ছদ্মবেশী), গানের সুরে জ্বালবো তারার দীপগুলি, (স্বপ্ন ও সাধনা) মানুষের মনে ভোর হল আজ (সমাপিকা) লিখিনু যে লিপিখানি (শ্রী তুলসীদাস), মাটির ঘরে আজ নেমেছে চাঁদ (বিদ্যাসাগর), ঝির ঝির ঝির বর্ষায় (পাশের বাড়ি), ভাঙনের তীরে ঘর বেঁধে কিবা ফল (ঢুলি), ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস (শাপমোচন), জানি না ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া (সবার উপরে), হৃদয় আমার সুন্দর তব পায়ে (সাগরিকা), এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয় (একদিন রাত্রে), মনমাঝি তোর বৈঠা নেড়ে (নবজন্ম), আকাশের অন্তরাগে (সূর্যমুখী), নীড় ছোটো ক্ষতি নেই আকাশ তো বড়ো (ইন্দ্রাণী), তোমার শেষ বিচারের আশায় আমি বসে আছি (ডাকহরকরা), মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে (লুকোচুরি), প্রাণ ঝরনা জাগলো (লালুভুলু), তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ (মরুতীর্থ হিংলাজ), নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী (নীল আকাশের নীচে), শোন শোন গেরোবাজ খোপ থেকে বেরো আজ (মায়ামৃগ), পৃথিবীর গান আকাশ কী মনে রাখে (গরীবের মেয়ে), এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন (শেষ পর্যন্ত), আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না (নতুন ফসল), যে বাঁশি ভেঙে গেছে (স্বরলিপি), ওগো যা পেয়েছি সেইটুকুতেই খুশি আমার মন (দুই ভাই), জীবনপুরের পথিক রে ভাই (পলাতক), গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে (দেয়া নেয়া), এ যেন অজানা

এক পথ (রাজকন্যা), নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা (মণিহার), আমি যামিনী তুমি শশী হে (অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি), বড়ো একা লাগে (চৌরঙ্গী) ফুল পাখি, বন্ধু আমার ছিল (চিরদিনের), জীবনে কী পাব না (তিন ভুবনের পারে), বাজে গো বীণা (মর্জিনা আবদুল্লা), আমরা তো আর ছোটো নেই (জয়জয়ন্তী)—বাংলা সিনেমার গানের এই ধারাবাহিকতা এসে আছড়ে পড়েছে 'টুকুন আমার টুকুন তোমার মাথায় বাছব আমি ভালোবাসার উকুন'—এমন প্রেমের গানে। একালের আরও দু'চারটি পপুলার গানের দৃষ্টান্ত তুলে আনলে মানসিকতাটা স্পষ্ট হবে। 'তুই আমার রাণি আমি তোর রাজারে, এমন আর পাবি না বাংলা খাজাঁরে', 'কৃষ্ণ করলে লীলা, আমরা করলে বিলা', 'তুমি আমার কোকা কোলা', 'খোকাবাবু যায় বড়ো বড়ো দিদিরা সব ফিরে ফিরে চায়', 'ওরে আমার প্যারিলাল রে', 'হানড্রেড পার্সেন্ট লভ লভ লভ', 'তোকে লাগছে হেভ্‌ভি', 'খোকা ফোর টুয়েন্টি', 'পাগলু থোড়াসা করলে রোমান্স' বাংলা ছবির সাম্প্রতিক চালচিত্রে সোচ্চার এইসব গান জনপ্রিয়। শুধু পরবর্তী হিট এসে পূর্ববর্তীর কয়েক সপ্তাহের দাপট ম্লান করে দেয়।

মেইনস্ট্রিম বাংলা ছবিতে চার থেকে ছ'টি গান ঢোকাবার একটি ছক চলে আসছে অনেকদিন ধরেই, সংখ্যাটা বাড়লে বা কমলে মূল ছবিটির গুণগত মানের কোনো হেরফের হয় না। চিত্রনাট্য গানের দাবি করুক বা না-করুক দর্শকের চাহিদা থেকে দেখবার গান আসে। অতীতে গানের দৃশ্যে ছবির পাত্রপাত্রীরা যত কম নড়াচড়া করতেন তা সুদে-আসলে পুষিয়ে দিতে গানের দৃশ্যে হাত পা ছোড়াছুড়ি ক্রমবর্ধমান। উত্তেজনা এবং উন্মাদনা তৈরির দায় বর্তেছে গানের ওপর, ফলে গানের লিরিক-মেলোডি ছাপিয়ে উদ্দামতায় আক্রান্ত হয়ে অধিকাংশ গান। চোখের জন্য দৃষ্টিনন্দন লোকেশন খুঁজতে ফিল্ম ট্যুরিজম চালু হয়েছে, কলকাতা শহরে কথা বলতে-বলতে গানের খিদে পেলে নায়ক-নায়িকা উড়ে যায় মরিশাস, অস্ট্রেলিয়া, টেমস বা পিরামিডের দোড়গোড়ায়, উত্তেজক নৃত্য হয়। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে ফর্মূলায় যে গুলিগোলা বন্দুক নিয়ে অ্যাকশন করে তাকেই ডিস্কো ড্যান্সার সেজে নাচতে হয়—ফলে দুটি ক্ষেত্রেই উত্তেজনা আসে। একজন প্রবীণ প্রযোজক পরিচালক বলেছিলেন, আগে ফিল্মি মন নিয়ে ছবি তৈরিতে আসতেন অনেকেই, এখন ব্যবসায়ীরাই সিনেমা বানাবে—আমাদের ছুটি নেবার সময় হয়েছে। সিনেমা ব্যবসায় পুঁজির বিনিয়োগ বেড়েছে, লাখ থেকে কোটির হিসেবেও পৌঁছেছে ছবির ব্যয়।

অতএব বক্স অফিস হয়ে উঠছে পাখির চোখ, বাণিজ্যসফল দক্ষিণী ছবির কপি সেখানে হয়ে উঠছে ছবি হিট করানোর ফর্মূলা, তার গান নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা অর্থহীন। বাংলা ছবিতে গোটা নয়ের দশকে হিট গানেরও ছিল আকাল। অর্থাৎ গানের বাণিজ্যিক সাফল্যও আসেনি। একটি মাত্র গান নতুন শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত জনপ্রিয় হয়েছিল 'ও বন্ধু তুমি শুনতে কী পাও এ গান আমার'। ইতিমধ্যে বাংলা সিনেমার দর্শক এবং ছবির গানের শ্রোতাদের পালাবদল ঘটে গেছে, গানে মগ্ন হবার অবকাশ বা প্রবণতাও হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। পরিবেশের শব্দদূষণকে পেরিয়ে শ্রোতার মনোযোগ কেড়ে নিতে গানেও শব্দের দাপট বেড়েছে। গোটা গান শোনবার ধৈর্য না থাকতে পারে এই আশঙ্কায় সংগীত প্রতিযোগিতায় গাওয়া হয় গানের অর্ধেক বা সিকিভাগ। পুরো গান আজ আর জনপ্রিয় হয় না, গানের একটি ফ্রেজ বা দুটি পঙ্‌ক্তির সমাদর হয়। গানের নির্মাণ বা মান নির্ণায়নের চেয়ে শব্দধারণের উৎকর্ষ, সংগীতায়োজনের গ্র্যাঞ্জার, গানের প্রোমো তৈরিতে বিনিয়োগ হয় অধিক মেধা। প্যাকেজিং এখন গানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, গানের চেয়ে তার বিপণন-প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যস্ততা থাকে বেশি। ফলে একদিন গানের কাছে সিনেমার গুরুত্ব কম ছিল, এখন সেখানে আর্থিক বিনিয়োগ থেকে ট্র্যাকে সংগীত সংযোগ কোরিয়োগ্রাফি—শরীরী প্রদর্শনের কাছে গানটাই গুরুত্ব হারিয়ে উপলক্ষ মাত্র। মেইনস্ট্রিম ছবিতে গান এখন 'আইটেম'। সিনেমার মেনুকার্ডে আরও দশটা আইটেমের মতোই যার পছন্দ সে শোনে, অন্যরা ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে পরের আইটেমে চলে যায়।

একসময় বাংলা গানের মূলস্রোত থেকে পুষ্টি এবং প্রাণশক্তি পেয়েছিল সিনেমার গান, আশির দশকে দুই ধারাতেই দৈন্য প্রকট হয়েছে, নব্বইয়ের দশকে বাংলা গানে যে পালাবদলের হাওয়া এসেছিল, সিনেমার গানে তার প্রভাব স্বাস্থ্যকর হতে পারত, কিন্তু তা ঘটেনি। নতুন প্রজন্মের কয়েকজন সুরকার যেমন সুমন-নচিকেতা-বিক্রম ঘোষ অন্যরকম কাজের দু'একটি দৃষ্টান্ত গড়লেও ইন্ডাস্ট্রি তাদের সেভাবে মদত দেয়নি বা ব্যবহারে উদ্যোগ নেয়নি। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার অনেক আগে থেকেই এদেশের মিউজিক ট্রেড মন্দার শিকার। বৃহৎ বাজার এবং ব্যাপক প্রচারের সূত্র ধরে হিন্দি ছবির গান খানিকটা বাণিজ্য করলেও বাংলা ছবির নতুন গানের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি—এভাবেই শেষ হয়েছে সিনেমার গানের বিশ শতক।

কখনো প্রত্যক্ষভাবে পুরোনো গানের রিমেক হয়েছে—যেমন 'সাধের লাউ' বা 'জীবনে কী পাব না', অন্যথায় কিছু অকিঞ্চিৎকর প্রেমের গান সেই সঙ্গে

ফাঁক-ফোকরে গুঁজে দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান। এই ছন্নছাড়া চরিত্র এবং অনিশ্চয়তার ছবি ক্রমাগত প্রতিফলিত বাংলা ছবির গানে।

শিল্পের ক্ষেত্র দিনে দিনে প্রসারিত হয়, পরিণত রূপবন্ধ বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা প্রকাশের উৎসমুখ খুঁজে পায়, সেক্ষেত্রে বাংলা সিনেমার গান মনুষ্যজীবনের হিসেবে সত্তরেই জরাগ্রস্থ—তার শরীর আছে, কমে গেছে প্রাণশক্তি, ঘাটতি পড়েছে উজ্জীবনী সাধ্যে। অথচ আশ্চর্য! গান নিয়ে মাতামাতি বহুগুণ বেড়ে গেছে। বোতামের নির্দেশে অষ্টপ্রহর দৌড় চলেছে গান-থেকে-গানে। শোনবার ব্যাপারটাও বেশ গোলমেলে, বাস ট্যাক্সি, অটোয় অষ্টপ্রহরই গান বাজে, শোনে ক'জন—অথবা শোনা যায় কতটুকু? 'অটো রিদম' বলে একটি ফ্রেজ চালু হয়েছে, পাশ দিয়ে অটো চলে গেলে 'ঝিনচ্যাক্' ঢেউ উঁকি দিয়ে যায়। তাহলে গান বাজানো মানেই শোনা নয়। গান এখন উন্মাদনা, উত্তেজনা ছড়ানোর ক্ষেত্রে বেশি সহায়ক, এজন্যই 'মিউজিক্যাল হাঙ্গামা-ধামাকা' হয় গানের আসরের শিরোনাম। এমন গান সিনেমাকেও সরবরাহ করতে হয় এবং তা হিট হয়। সব মিলিয়ে সিনেমার স্বার্থরক্ষায় তত ফলপ্রসূ না হলেও ছায়াছবির গানের যে একটি সমৃদ্ধ ধারা তৈরি হয়েছিল, তা অতীত গৌরব হয়ে আছে। অতীতের যতই গৌরব থাক, আজকের গান সেদিনের মতো নয় বরং এদিনের মতোই হবে, গীতরচনা-সুর সংযোজনা-গায়কী এবং যন্ত্রানুষঙ্গ সব ব্যাপারেই সাম্প্রতিক অর্থে আধুনিকতার প্রতিফলন ঘটবে। প্রতিভাবান শিল্পী বা গাননির্মাতার অনটন নেই, একসঙ্গে একদল গুণী শিল্পী না এলেও সাম্প্রতিক ছবির গানে আবার আশার সংকেত দেখা উঁকি দিচ্ছে।

হঠাৎ বৃষ্টি, সেদিন চৈত্রমাস, গান্ধর্বী, হঠাৎ নীরার জন্য ছবির গান যে সূত্রপাত ঘটিয়েছিল শান্তনু মৈত্রর 'অন্তহীন', অঞ্জন দত্ত-নীলের 'ম্যাডলি বাঙালী', 'বং কনেকশন' এবং পরবর্তী 'অটোগ্রাফ', 'কোলকাতা ডট কম' থেকে 'জাতিস্মর', ইন্দ্রদীপ-অনুপম-দেবজ্যোতি-অনিন্দ্য-শ্রীজাত-শ্রেয়া-শ্রীকান্ত-রূপঙ্কর-রূপম-অভিজিৎ ও শুভমিতার এবং এমন নতুন প্রজন্মের তৈরি বলয় সমকালীন বাংলা ছায়াছবির গানের বিবর্ণ প্রেক্ষাপটে কিঞ্চিৎ রং লাগিয়েছে—দর্শক-শ্রোতার মনে ধরছে সেইসব গান। সময় বলবে এদের প্রভাব এবং বিস্তার কতদিনে কতটা ঘটে। তবে এর পাশাপাশি পপুলার ধারায় অন্য সিনেমার অনেক গান শুনলে চট করে বাংলা গান বলেই বোঝা শক্ত, 'হমে প্যার দো', 'তুম লে লো', 'থোড়াসা রোমান্স' বা 'হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ' ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এইসব গানই নাকি শ্রোতাদের বাংলা গানমুখীন

করে তুলেছে এমন ঘোষণা মাঝেমধ্যেই শোনা যায়, সেটি সত্যি হলে বাংলা গানের 'সমৃদ্ধি' শব্দটা অধরাই থেকে যাবে। বাংলা ভাষাটাই বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, ফলে এস. এম. এস-এর ভাষায় তৈরি এইসব গানই হয়তো উত্তরকালের শাসক, তবে তাতে অতীত ছায়াছবির গানের মহিমা আরও বাড়বে। সিনেমার গান যদি ইমেজের সঙ্গে মিশে সিনেমার স্বার্থসিদ্ধি না করে, গান হিসেবেও যদি তা গুরুত্ব আদায় না করতে পারে, তার শ্রুতিমাধুর্যও যদি বিপর্যস্ত হয় তাহলে হাতে থাকবে চিবিয়ে-ফেলা রোল জড়ানোর কাগজের টুকরো বা কোক ফুরোনো তোবড়ানো ক্যান, আর সিনেমার গানের পুরোনো চাল—কোনোটাই সাম্প্রতিকের পক্ষে সুখের বা গৌরবের নয়।